ইনফো মেডিকাস

স্বাস্থ্য সাময়িকী

এপ্রিল ২০২৪ | ১৩তম পর্ব | ৩য় সংখ্যা

সূচী

রোগের ইতিকথা	২
মানবদেহ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৫
বিশেষ প্রবন্ধ	৬
জীবাণু পরিচিতি	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
সাধারণ জিজ্ঞাসা	১২
প্রাথমিক চিকিৎসা	১৩
স্বাস্থ্যকথা	১৪
ইনফো কুইজ	১৫

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ রুমানা দৌলা
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক
ডাঃ সাইকা বুশরা
ডাঃ মারেফুল ইসলাম মাহী
ডাঃ পার্থ পন্ডিত সাগর
ডাঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম হিমেল
ডাঃ মোহাম্মদ তকি তাজওয়ার
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড-১২৩, বাড়ী-১৮এ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

হেপাটাইটিস বি

হেপাটাইটিস বি হলো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (HBV) দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ যা লিভারকে প্রভাবিত করে। ভাইরাসটি সাধারণত রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে। এছাড়া আক্রান্ত মা থেকে নবজাতক শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। সদ্য সংক্রমিত হলে অধিকাংশ মানুষে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। জন্ডিস, গাঢ় রঙয়ের প্রস্রাব, ক্লান্তিভাব, বমি বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা এই রোগের লক্ষণ। গুরুতর হলে হেপাটাইটিস বি থেকে লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার হয়ে মৃত্যু হতে পারে। ১৯৬৫ সালে আমেরিকান চিকিৎসক ডা. বারুক স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ হেলথ (এনআইএইচ)-এ কর্মরত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রক্তে অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন নামক অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন যা পরবর্তীতে হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন বা HBsAg নামে পরিচিতি পায়। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আবিষ্কারের চার বছর পর ডা. ব্লুমবার্গ এবং আমেরিকান মাইক্রোবায়োলজি বিশেষজ্ঞ আরভিং মিলম্যান প্রথম হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) প্লাজমা থেকে প্রাপ্ত হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন অনুমোদন করে যা "হেপ্টাভ্যাক্স" নামে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন।

ডা. বারুক স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ
(Dr. Baruch Samuel Blumberg)
(১৯২৫-২০১১)

আরভিং মিলম্যান
(Irving Millman)
(১৯২৩-২০১২)

মানবদেহ

মস্তিষ্ক

মস্তিষ্ক বা ব্রেইন হলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্ফীত, বৃহৎ ও জটিল অংশ যা মানুষের করোটির (skull) সুরক্ষিত করোটিকার (cranium) মধ্যে অবস্থান করে দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, বিশাল তথ্যরাশির প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ করে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। প্রাণিজগতের মধ্যে মানব মস্তিষ্কই সবচেয়ে জটিল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ সিসি ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি। এর গড় ওজন প্রায় ১.৩ - ১.৪ কেজি যা দেহের মোট ওজনের ২%। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) নিউরন থাকে। মানব ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্ক প্রধান তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ মানুষে এটি আরো জটিল রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়।

মস্তিষ্কের গঠন

মানব ভ্রূণের মস্তিষ্কের গঠনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মস্তিষ্ককে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা -

১। অগ্রমস্তিষ্ক বা ফোরব্রেইন

২। মধ্যমস্তিষ্ক বা মিডব্রেইন

৩। পশ্চাৎমস্তিষ্ক বা হাইন্ডব্রেইন

১। **অগ্রমস্তিষ্ক:** অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। এটি তিন অংশে বিভক্ত, যথা - সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস।

২। **মধ্যমস্তিষ্ক:** হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সংকুচিত অংশকে মধ্যমস্তিষ্ক বা মিডব্রেইন বলে। এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় গহ্বরকে ঘিরে রাখে। অঙ্কীয়দিকে এটি একটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা পনস্ ও সেরেবেলামকে সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সাথে যুক্ত করে। মধ্যমস্তিষ্ক চারটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা - টেকটাম, সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা ও সেরেব্রাল পেডাঙ্কল।

৩। **পশ্চাৎমস্তিষ্ক:** পশ্চাৎমস্তিষ্ক তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা - সেরেবেলাম, পনস্ ও মেডুলা অবলংগাটা।

মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরভাগ তরলপূর্ণ গহ্বর সমৃদ্ধ। এ গহ্বর কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের এসব প্রকোষ্ঠকে ভেন্ট্রিকল বা সেরেব্রাল ভেন্ট্রিকল বলে। মস্তিষ্কে মোট চারটি ভেন্ট্রিকল আছে। এদের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল বলে। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলদ্বয়কে পার্শ্বীয় বা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল বলে। মস্তিষ্কের গহ্বরের তরলকে সেরেব্রোস্পাইনাল তরল বা সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF) বলা হয়।

মস্তিষ্কের গঠন

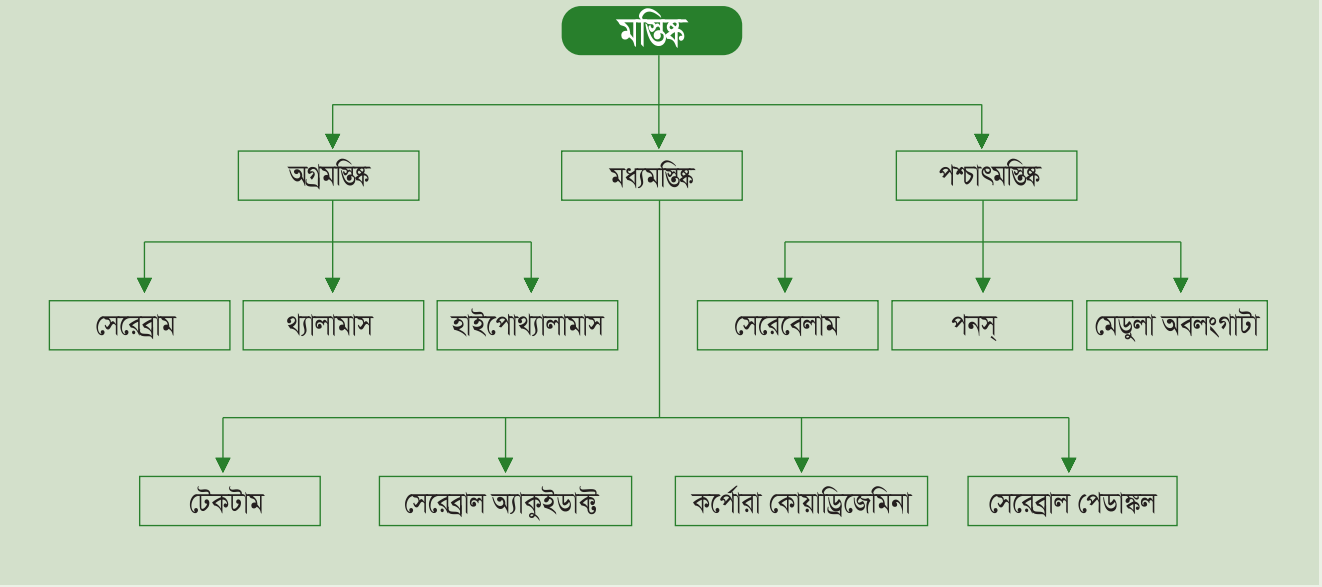

মস্তিষ্কের কাজ

- সেরেব্রাম সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে, বাকশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, ইচ্ছাশক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে ও দেহের সকল ঐচ্ছিক পেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে
- থ্যালামাস গন্ধ ব্যতীত সকল সংবেদী উপাত্তকে সমন্বয় করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে। স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। চেতনা, ঘুম ও সতর্কতা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে
- হাইপোথ্যালামাস শরীরের তাপমাত্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হরমোন নিঃসরণ এবং মানসিক প্রতিক্রিয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং পিটুইটারি গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ করে যা শরীরের অনেক হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগরণ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে
- মধ্যমস্তিষ্ক বিভিন্ন ভিজুয়াল (দর্শন) ও অডিটরি (শ্রবণ) তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে
- সেরেবেলাম দেহের প্রায় সকল ধরনের অনৈচ্ছিক কার্যাবলি যেমন - হাঁচি, কাশি, হেঁচকি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে; পেশির টান, দেহের ভারসাম্য ও ভঙ্গিমা রক্ষা করে; দেহের সকল ধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে
- মেডুলা অবলংগাটা প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, খাদ্য গলাধঃকরণ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তনালির সঙ্কোচন-প্রসারণ, হৃদস্পন্দন, ফুসফুসের সঙ্কোচন-প্রসারণ, লালাগ্রন্থির ক্ষরণ, মল-মূত্র ত্যাগ, ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে
- পনস্ প্রতিবর্ত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, শ্বসন কার্য নিয়ন্ত্রণ করে, স্পাইনাল কর্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সঞ্চালন পথ হিসেবে কাজ করে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে

মস্তিষ্কের রোগ

- স্ট্রোক
- ডিমেনশিয়া
- ব্রেইন ক্যান্সার
- মৃগী রোগ বা এপিলেপসি
- খিঁচুনি বা সিজার ডিজর্ডার
- মানসিক ভারসাম্যহীনতা
- পারকিনসন ডিজিজ
- আলঝেইমার রোগ

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

থাইরোগ্লোসাল সিস্ট

ভ্রূণাবস্থায় জিহ্বার নিচ থেকে গলায় থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থান পর্যন্ত প্রসারিত থাইরোগ্লোসাল নালী নামক একটি নালী থাকে। এই নালী দিয়ে ভ্রূণাবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থি উপর থেকে নিচে নেমে আসে। থাইরয়েড গ্রন্থি গলায় আসার পর এই নালীটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোনো কারণে যদি নালীটি বিলুপ্ত না হয়, তখন তরল ও শ্লেষ্মা দিয়ে পূর্ণ হতে পারে এবং থাইরোগ্লোসাল সিস্টে পরিণত হতে পারে। এই সিস্টগুলি সাধারণত ছোট (প্রায় ২ সে.মি.) হয়ে থাকে। বেশিরভাগ থাইরোগ্লোসাল সিস্ট ১০ বছর বা তার কম বয়সী শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায়। সিস্টটি গলায় বাইরে থেকে দেখা যায় এবং হাত দিয়ে অনুভব করলে ছোট বলের মতো নরম, মসৃণ এবং গোলাকার অনুভূত হয়। গলা পরীক্ষা করে থাইরোগ্লোসাল সিস্ট নির্ণয় করা যায়।

সায়ানোসিস

রক্তে অক্সিজেনের অভাবের কারণে যখন ত্বক, ঠোঁট বা নখ নীল হয়ে যায়, তখন তাকে সায়ানোসিস বলে। সায়ানোসিস শব্দটি এসেছে "সায়ান" শব্দ থেকে যার অর্থ নীল-সবুজ রঙ। যখন রক্তে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সঞ্চালিত না হয়, তখন এটি নীল বা বেগুনি রঙ ধারণ করে। সায়ানোসিস তিন ধরনের হয়ে থাকে - পেরিওরাল (মুখ বা ঠোঁট নীল হওয়া), পেরিফেরাল (হাত, পা বা আঙুল নীল হওয়া) এবং সেন্ট্রাল (হাত-পাসহ বুক, গাল, জিহ্বা, মাড়ি নীল হওয়া)। সাধারণত ঠাণ্ডা তাপমাত্রার সংস্পর্শে সায়ানোসিস হয়। এছাড়া শ্বাসনালী, ফুসফুস, হৃদপিণ্ডজনিত সমস্যায় সায়ানোসিস হয়ে থাকে। শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও সায়ানোসিসের কারণ নির্ধারণের জন্য পালস অক্সিমেট্রি, রক্ত পরীক্ষা, ব্লাড গ্যাস এনালাইসিস, বুকের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম, ইসিজি, পালমোনারি ফাংশন পরীক্ষা, কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন, ইত্যাদি করা হয়।

আঁচিল

আঁচিল বা ওয়ার্ট হলো ক্যান্সারবিহীন (বিনাইন) সংক্রমণ যা ত্বকে হয়ে থাকে। হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (HPV) দ্বারা এটি হয়ে থাকে। এইচপিভি ভাইরাস ত্বকের কাটা অংশে প্রবেশের মাধ্যমে ত্বকে সংক্রমণ ঘটায় যা আঁচিল তৈরি করে। হাত, পা, নখের চারপাশ, মুখ ও যৌনাঙ্গে এটি হতে পারে। ভাইরাস দ্বারা দূষিত পদার্থ স্পর্শ, অনিরাপদ যৌন মিলন, নখ কামড়ানো, ইত্যাদির মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। খালি চোখে দেখে আঁচিল নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় ত্বকের বায়োপসি নমুনা নিয়ে এইচপিভি পরীক্ষা করা হয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরে আঁচিল নিজে থেকেই সেরে যায়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

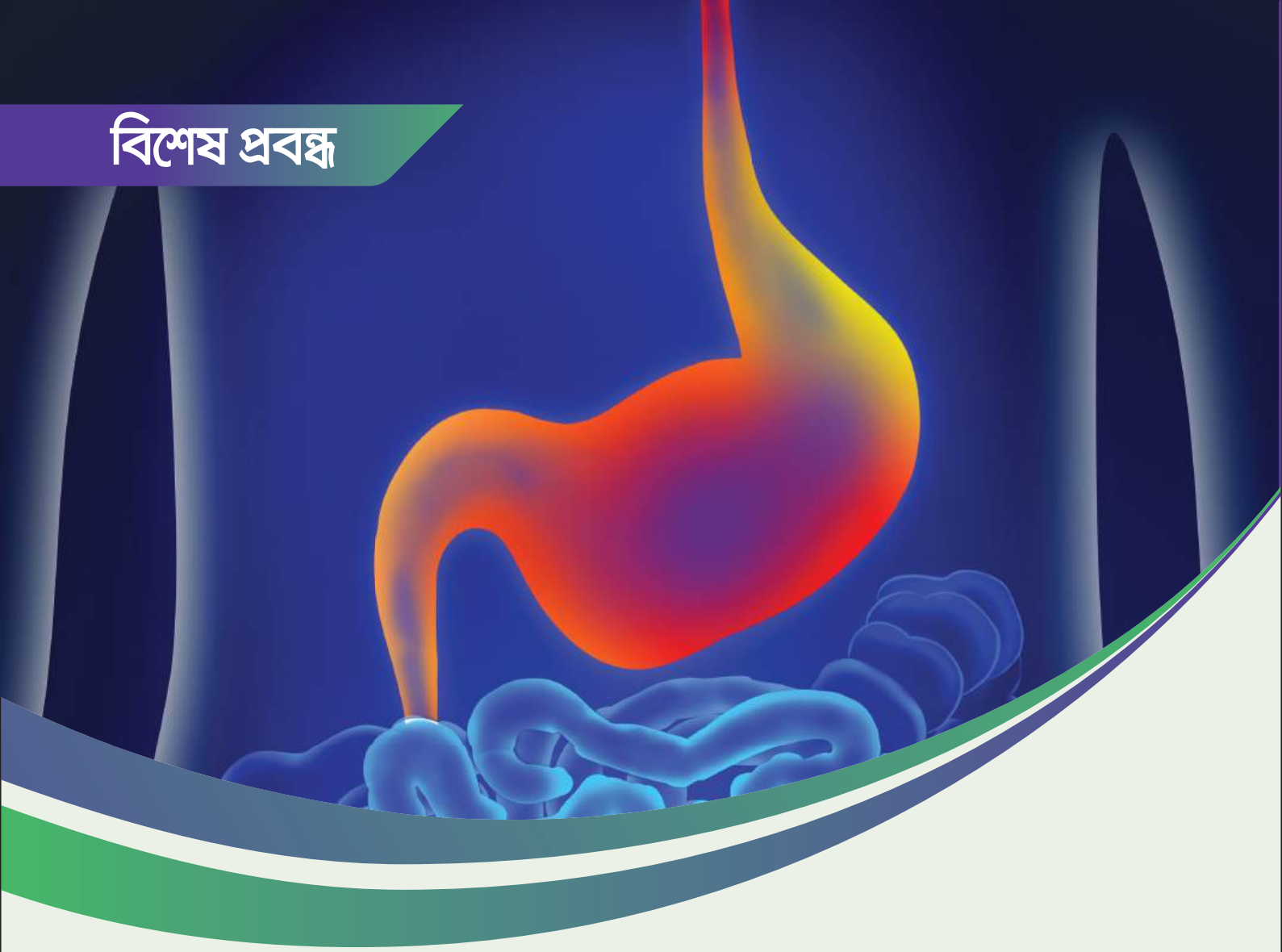

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ

আমরা যখন খাবার খাই, খাবারের সাথে পাকস্থলীর অ্যাসিড নিচের দিকে অন্ত্রে প্রবাহিত হয়। যদি এর উল্টো ঘটে, অর্থাৎ পাকস্থলীর অ্যাসিড নিচে না নেমে বরং ওপরে গলার দিকে উঠে আসে, তখন আমরা বুকে জ্বালাপোড়া অনুভব করি। একে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা হার্টবার্ন বলা হয়। অনেকেই এটিকে গ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, অ্যাসিডিটি বা অম্বল বলে থাকে। এমন জ্বালাপোড়া যদি বারবার হতে থাকে, তখন এই রোগকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (Gastroesophageal Reflux Disease)।

কারণ

খাদ্যনালীর নিচের দিকে অবস্থিত নিম্ন খাদ্যনালী স্ফিংক্টার (Lower Esophageal Sphincter) নামক ভালভ পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে অ্যাসিড প্রবাহে বাঁধা দেয়। এটি একটি বৃত্তাকার পেশী যা খাবার গিলে ফেলার সময় খোলে এবং পাকস্থলীতে প্রবেশের পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। যখন এই ভালভ দুর্বল হয়ে যায়, তখন অ্যাসিড রিফ্লাক্স ঘটে। নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই সময়ে সময়ে অনেকের বুক জ্বালাপোড়া করতে পারে। তবে মাঝেমধ্যে কিছু জিনিস এই জ্বালাপোড়ার সূত্রপাত ঘটায় বা তীব্রতা বাড়ায়। যেমন -

- নির্দিষ্ট কিছু খাবার ও পানীয়: চর্বিযুক্ত বা মসলাদার খাবার, চা, কফি, চকলেট, ইত্যাদি
- ধূমপান, অ্যালকোহল
- মানসিক চাপ ও উদ্বেগ
- ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া
- গর্ভাবস্থা
- হায়াটাস হার্নিয়া (hiatus hernia) নামক একটি রোগ যেখানে পাকস্থলীর কিছু অংশ বুকে উঠে আসে
- এনএসএআইডি (ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগ) যেমন অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন

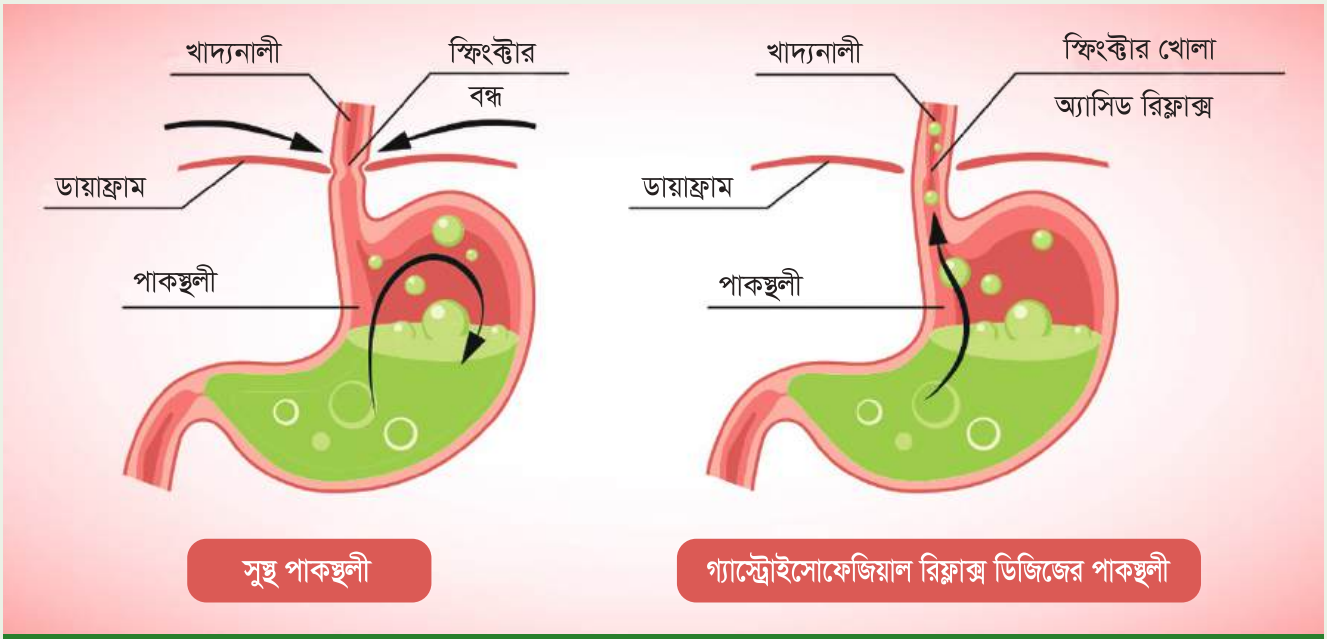

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের কারণ

লক্ষণ

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ-এর সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হলো বুকজ্বালা। এটি সাধারণত বুকে জ্বালা ও ব্যথার মতো অনুভূত হয় যা বুকের হাড়ের পিছনে শুরু হয় এবং ঘাড় ও গলা পর্যন্ত চলে যেতে পারে। অনেকে বলে যে মনে হচ্ছে খাবার মুখের মধ্যে ফিরে আসছে ও তিক্ত স্বাদ রেখে যাচ্ছে।

জ্বালাপোড়া, চাপ বা অম্বলের ব্যথা ২ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এটি প্রায়ই খাওয়ার পরে শুরু হয়। খাওয়ার পরে শুয়ে থাকার ফলেও বুকজ্বালা হতে পারে। অনেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালে বা অ্যান্টাসিড গ্রহণ করলে ভালো বোধ করেন।

অনেকে হৃদরোগের ব্যথা বা হার্ট অ্যাটাকের সাথে অম্বল ব্যথাকে মিলিয়ে ফেলেন। তবে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যায়াম হৃদরোগের ব্যথাকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে এবং বিশ্রামে এটি উপশম হতে পারে। কিন্তু গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ-এর ব্যথা বিশ্রামে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যথা ছাড়াও অন্যান্য লক্ষণ থাকতে পারে। সেগুলো হলো:

- বমি বমি ভাব
- নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
- শ্বাসকষ্ট
- খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া
- বমি
- দাঁতের এনামেল ক্ষয় হয়ে যাওয়া

যদি রাতে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয়, তাহলে দীর্ঘস্থায়ী কাশি, ল্যারিঞ্জাইটিস, হাঁপানি বা ঘুমের সমস্যা হতে পারে। খাওয়ার পরে, শোবার পরে বা উপুড় হলে লক্ষণগুলো আরো তীব্র রূপ ধারণ করতে পারে।

শিশুদের গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যদি তারা নির্ধারিত সময়ের আগে জন্ম নেয় বা তাদের খাদ্যনালীকে প্রভাবিত করে এমন অবস্থা থাকে। শিশুদের মধ্যে এর লক্ষণগুলি হলো:

- কান্নাকাটি বেশি করা
- ঘুমাতে অসুবিধা হওয়া
- খেতে না চাওয়া
- বমি করা
- শ্বাসের সময় শব্দ হওয়া

পরীক্ষা

সাধারণত রোগীর লক্ষণ দেখে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ নির্ণয় করা হয়। এছাড়া রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা রয়েছে। পরীক্ষাগুলো হলো:

- এন্ডোস্কোপি
- বেরিয়াম সোয়ালো এক্স-রে
- খাদ্যনালীর পিএইচ (pH) পরীক্ষা
- ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি

চিকিৎসা

- **ঘরোয়া পদ্ধতি:** কারো গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স হলে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি মেনে অ্যাসিড রিফ্লাক্স থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বসে বা শুয়ে থাকলে উঠে দাঁড়াতে হবে। অল্প পরিমাণ পানি পান করতে হবে। পানি অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কোমড়ে যদি আঁটসাঁট পোশাক থাকে, তাহলে তা ঢিলা করতে হবে।
- **ওষুধ:** গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের জন্য কিছু ওষুধ আছে। যেমন: অ্যান্টাসিড, অ্যালজিনেটস, হিস্টামিন রিসেপ্টর ব্লকার (H2 ব্লকার) ও প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরস (পিপিআই)।
- **অস্ত্রোপচার:** ঘরোয়া পদ্ধতি ও ওষুধে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ না সারলে অস্ত্রোপচার করতে হয়। ল্যাপারোস্কোপিক ফান্ডোপ্লিকেশন ও এলআইএনএক্স ডিভাইস (LINX device) - এর সাহায্যে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ চিকিৎসা করা হয়।

প্রতিরোধ

দৈনন্দিন জীবনে সহজ কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ সারিয়ে তোলা বা কমিয়ে আনা যায়। যেমন -

- একবারে ভরপেট না খেয়ে সারা দিনে ভাগ করে অল্প অল্প করে খাবার খেতে হবে
- যে সকল খাবার কিংবা পানীয় খেলে সমস্যা বেড়ে যায়, সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে
- রাতে ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত ৩-৪ ঘন্টা আগে রাতের খাবার খেতে হবে
- বিছানায় শোবার সময় মাথা ও বুক কোমরের চেয়ে উঁচু অবস্থানে রাখতে হবে
- কোমরে আঁটসাঁট করে পোশাক পরা যাবে না
- ওজন অতিরিক্ত হলে তা কমিয়ে ফেলতে হবে
- ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে
- ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা যাবে না

জটিলতা

অনেকদিন ধরে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থাকলে বা সঠিক চিকিৎসা করা না হলে কিছু জটিলতা দেখা যেতে পারে। জটিলতাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ইসোফেজাইটিস
- ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার
- ব্যারেট'স ইসোফেগাস
- রক্তাল্পতা
- খাদ্যনালী সরু হয়ে যাওয়া
- ল্যারিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লাক্স
- হাঁপানি
- ব্রঙ্কাইটিস
- নিউমোনিয়া
- গ্যাস্ট্রিক ভলভুলাস

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ প্রতিরোধের উপায়

সারা দিনে ভাগ করে অল্প অল্প করে খাবার খেতে হবে

চর্বিযুক্ত বা মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলতে হবে

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার ৩-৪ ঘন্টা আগে রাতের খাবার খেতে হবে

শোবার সময় মাথা ও বুক কোমরের চেয়ে উঁচু অবস্থানে রাখতে হবে

কোমরে আঁটসাঁট করে পোশাক পরা যাবে না

অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে

ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে

ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা যাবে না

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি

বৈশিষ্ট্য

- এটি এক ধরনের গ্রাম-পজেটিভ ব্যাক্টেরিয়া
- এটি জোড়া (ডিপ্লোকক্কাই) আকারে অথবা ছোট চেইন আকারে থাকে
- এটি ল্যানসেট আকৃতির হয়ে থাকে
- এটি ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানেরোবিক ব্যাক্টেরিয়া
- এর ক্যাপসুল থাকে
- এর ১০০টিরও বেশি সেরোটাইপ রয়েছে

যে সকল রোগ করে

স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি দ্বারা সাইনুসাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া, নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস ও ব্যাক্টেরেমিয়া হয়।

সংক্রমণ

ওরোফ্যারিংস ও ন্যাসোফ্যারিংসে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে

▼

শ্লেষ্মা ও অনুনাসিক এপিথেলিয়ামে বংশবিস্তার করে

▼

শ্লেষ্মার মাধ্যমে মধ্যকর্ণ, প্যারান্যাসাল সাইনাস ও শ্বাসনালীতে ছড়ায়

▼

মধ্যকর্ণ, প্যারান্যাসাল সাইনাস ও শ্বাসনালীতে সরাসরি সংক্রমণ করে

▼

ফুসফুসে প্রবেশ করে নিউমোনিয়া, রক্তে প্রবেশ করে ব্যাক্টেরেমিয়া ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মেনিনজাইটিস সৃষ্টি করে

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

বেল'স পালসি

বেল'স পালসি এমন একটি অবস্থা যেখানে মুখের পেশীগুলি দুর্বল বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটি সাধারণত মুখের যেকোনো একদিকে হয়, যার ফলে ঐদিকটি দুর্বল বা অবশ হয়ে বেঁকে যায় বা হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়। বেশিরভাগ সময় এর লক্ষণগুলি স্থায়ী হয় না।

ফেসিয়াল নার্ভ মুখের পেশীর নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্নায়ুতে কোনো ক্ষতির ফলে বেল'স পালসি হয়ে থাকে। সাধারণত উর্ধ্ব শ্বাসনালীর সংক্রমণের পরে, গর্ভাবস্থায়, ডায়াবেটিস রোগীদের, উচ্চ রক্তচাপ ও কম রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এটি হয়ে থাকে।

বেল'স পালসির সাথে স্ট্রোকের উপসর্গের কিছু মিল রয়েছে। উভয়ই মুখের একদিকে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং একই রকম উপসর্গ প্রকাশ করতে পারে, যেমন চোখ বন্ধ করতে সমস্যা হওয়া বা মুখের একপাশে অবশ হয়ে যাওয়া। কিন্তু এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত দিকের চোখে জল আসে বা কানে শব্দ হতে থাকে, তবে এটি বেল'স পালসি। মুখে স্বাদের পরিবর্তনও বেল'স পালসির লক্ষণ। কিন্তু যদি শরীরের একপাশে হাত বা পায়ে অসাড়তা বা দুর্বলতা অনুভব হয়, তবে এটি স্ট্রোক হতে পারে। বেল'স পালসিতে হাত বা পায়ে দুর্বলতা বোধ হয় না বা জিহ্বা নাড়াতে সমস্যা হয় না।

কারণ

বেল'স পালসি সাধারণত হারপিস সিমপ্লেক্স ১ ভাইরাসের কারণে হয়ে পারে। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে:

- অ্যাডেনো ভাইরাস
- কক্সস্যাকি ভাইরাস
- সাইটোমেগালো ভাইরাস
- এপস্টাইন-বার ভাইরাস
- হারপিস জোস্টার ভাইরাস
- এইচআইভি ভাইরাস

- ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস
- লাইম রোগ
- মধ্যকর্ণের সংক্রমণ
- মাম্পস ভাইরাস
- রুবেলা ভাইরাস

ঝুঁকি

বেল'স পালসি যে কোনো বয়সের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে। এটি পুরুষ এবং মহিলাদের সমানভাবে প্রভাবিত করে। বেল'স পালসি হওয়ার কিছু ঝুঁকি আছে। সেগুলো হলো -

- ডায়াবেটিস
- শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, যেমন ঠান্ডা বা ফ্লু
- উচ্চ রক্তচাপ
- মনোনিউক্লিওসিস
- স্থূলতা
- প্রিএক্ল্যাম্পসিয়া

লক্ষণ

বেল'স পালসির লক্ষণ হঠাৎ করে দেখা দেয়। লক্ষণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো -

- মুখের যেকোনো একদিকে পেশীর দুর্বলতা বা বেঁকে যাওয়া
- ভ্রু কোঁচকাতে না পারা
- চোখের পাতা নিচে নেমে যাওয়া
- চোখ বন্ধ করতে অসুবিধা হওয়া
- কথা বলতে অসুবিধা হওয়া
- চোয়ালে বা কানের পিছনে ব্যথা
- মাথাব্যথা
- স্বাদের অনুভূতি কমে যাওয়া
- শুকনো চোখ ও মুখ
- কানে শব্দ হওয়া (টিনিটাস)
- খাবার খেতে ও পান করতে অসুবিধা হওয়া

পরীক্ষা

বেল'স পালসির জন্য কোন ল্যাব পরীক্ষা নেই। সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা ও উপসর্গের উপর ভিত্তি করে এটি নির্ণয় করা হয়। মুখের পক্ষাঘাতের কারণ হতে পারে এমন অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো করা হয়:

বেল'স পালসির লক্ষণ

- রক্ত পরীক্ষা
- ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি (ইএমজি)
- এমআরআই
- সিটি স্ক্যান

চিকিৎসা

বেল'স পালসি চিকিৎসা না করলেও সম্পূর্ণ সেরে যায়। কিন্তু কিছু চিকিৎসা আছে যা দ্রুত নিরাময় করতে সাহায্য করে।

- **কর্টিকোস্টেরয়েড:** কর্টিকোস্টেরয়েড ফেসিয়াল নার্ভের ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। কর্টিকোস্টেরয়েড সবচেয়ে ভাল কাজ করে যদি লক্ষণ শুরু হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করা হয়।
- **অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ:** অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ কর্টিকোস্টেরয়েডের সাথে ব্যবহার করা হয়।
- **চোখের ড্রপ:** বেল'স পালসি যদি চোখ বন্ধ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, তাহলে চোখের ড্রপ বা মলম ব্যবহার করতে হবে যেন চোখ আর্দ্র থাকে। ময়লা ও ধুলো বের করতে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখতে চোখের প্যাচ ব্যবহার করা যায়।
- **অস্ত্রোপচার:** লক্ষণগুলি না সারলে বা জটিলতা থাকলে অস্ত্রোপচার করতে হবে।
- **ফিজিক্যাল থেরাপি:** ফিজিক্যাল থেরাপি মুখের পেশী শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করা যায় বা মুখের পেশীর ব্যায়াম করা যায়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

সাধারণ জিজ্ঞাসা

দুধ চা খেলে পেটে গ্যাস হয়?

চা হলো অন্যতম প্রিয় পানীয়। চা পাতায় ক্যাফেইন ও ট্যানিন থাকে। চায়ে দুধ যোগ করা হলে ক্যাফেইন ও দুধ পাকস্থলীর অ্যাসিড নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয় এবং ট্যানিন হজম প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এর ফলে পেটব্যথা, বমি বমি ভাব এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া সকালে খালি পেটে দুধ চা খেলে বিপাক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। খালি পেটে দুধ চা আলসারের ঝুঁকি বাড়ায়। দুধ চা হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, অস্থিরতার অনুভূতি বা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া নিয়মিত দুধ চা খেলে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। তাই প্রতিদিন দুধ চা খাওয়ার অভ্যাস না করাই ভালো।

জ্বর/ডায়রিয়া হলে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়?

জ্বর হলে অনেকেই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকেন। কিন্তু এটি ঠিক নয়। জ্বর হলে প্যারাসিটামল ঔষধ খেতে হবে, হাত-পা মুছে দিতে হবে, প্রচুর পরিমাণ পানি পান করতে হবে এবং বিশ্রাম নিতে হবে। এগুলোতে অধিকাংশ সময় জ্বর সেরে যায়। না জেনে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। আসলে একই ঔষধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কাজ করে। জীবাণুভেদে অ্যান্টিবায়োটিক ভিন্ন হয়। তাই প্রয়োজন ছাড়া এবং সঠিক নিয়ম না মেনে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ খেলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যেতে পারে যা শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ। সাধারণ ডায়রিয়ার ক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে ডায়রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। স্যালাইন হলো এর কার্যকরী চিকিৎসা। কেউ যদি দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করেন, সেটি তার ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

বেশি লবণ খেলে কী হয়?

মানবদেহের স্নায়ুর কাজ স্বাভাবিক রাখা, মাংসপেশির সংকোচন-প্রসারণ এবং দেহে পানি ও খনিজ পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আয়োডিনযুক্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ দরকার। তবে এখন অনেকেই প্রক্রিয়াজাত খাবার খেয়ে থাকেন যেগুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাকে। আর অতিরিক্ত লবণ দেহের জন্য ক্ষতিকর কারণ এতে সোডিয়ামের মাত্রা বেশি থাকে। বেশি লবণ ও সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে রক্তচাপ বাড়ে। ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া হৃদরোগ, পাকস্থলী ক্যান্সার, স্থূলতা, অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়, মেনিয়ার'স ডিজিজ নামক কানের রোগ এবং কিডনির রোগ দেখা দিতে পারে। তাই রান্নায় পরিমাণমতো লবণ ব্যবহার করতে হবে এবং খাবারের সাথে বাড়তি লবণ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

আগুনে পোড়া

হঠাৎ দুর্ঘটনায় শরীরের কোনো অংশ আগুনে পুড়ে গেলে তাৎক্ষণিক কিছু কাজ করে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়। যেকোনো ধরনের পোড়ার ক্ষেত্রেই যত দ্রুত সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসায় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে -

- রোগীকে তাপের উৎস থেকে অতি দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে ও আশেপাশে কেউ থাকলে তাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে হবে
- গায়ে লাগা আগুন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে, ভারী কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে, পানি দিয়ে কিংবা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে নিভিয়ে ফেলতে হবে। কাপড়ে আগুন ধরলে সেটি সাথে সাথে খুলে ফেলতে হবে
- পুড়ে যাওয়া স্থান থেকে কাপড় ও গয়না সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে কোনো কিছু চামড়ার সাথে লেগে গেলে সেটি টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করা যাবে না
- পোড়া স্থানে প্রবাহমান পানির নিচে বা ট্যাপের পানির নিচে আক্রান্ত স্থান অন্তত বিশ মিনিটের মতো ধরে রাখতে হবে। সাধারণ তাপমাত্রার বা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা যাবে। তবে বরফ ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা যাবে না
- ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত গজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
- রোগীকে একটি পরিষ্কার কম্বল অথবা চাদর দিয়ে মুড়িয়ে শরীরের অনুকূল তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে। ক্ষতস্থানে যেন কোনোভাবেই চাপ অথবা ঘষা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- মুখ অথবা চোখ পুড়ে গেলে রোগীকে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটি ফোলাভাব কিছুটা কমাতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে পা কিংবা শরীরের নিচের অংশ পুড়ে গেলে রোগীকে শুইয়ে দিয়ে পা উঁচু করে রাখতে হবে
- অ্যাসিড অথবা রাসায়নিক দিয়ে পুড়লে রাসায়নিকে ভেজা কাপড় সাবধানে সরিয়ে ফেলতে হবে। হাসপাতালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ক্ষতস্থানটি প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে

পোড়ার পরিমাণ বেশি হলে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। আক্রান্ত স্থানে টুথপেস্ট, তেল ও হলুদ ব্যবহার করা যাবে না। ক্ষতস্থানে সরাসরি তুলা, টিস্যু কিংবা ক্রিম লাগানো যাবে না। ফোসকা পড়লে তা হাসপাতালে যাওয়ার আগে ফাটানো যাবে না। চিকিৎসকের পরামর্শের বাইরে কোনো ধরনের ড্রেসিং, মলম বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস প্রতিরোধে করণীয়

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলো অ্যালার্জিজনিত নাকের প্রদাহ। এর উপসর্গগুলো হচ্ছে অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে পানি পড়া এবং নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া। কারও কারও চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক উপকরণ ও পরিবেশের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রভাবে এই অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। যেমন - ধুলাবালি, আর্দ্র আবহাওয়া, ফুলের রেণু, পশুপাখির চুল বা খড়ের সংস্পর্শে আসা। অ্যালার্জি উদ্রেককারী জিনিসের সংস্পর্শ যথাসম্ভব কমিয়ে আনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যায় -

যেসব খাবার অ্যালার্জির উদ্রেক করে, সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন - বাদাম, বেগুন, পুঁইশাক, চিংড়ি, গরুর গোস্ত, ডাল, ইলিশ মাছ ইত্যাদি।

ধুলাবালি এড়িয়ে চলার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

বিছানার চাদর, কাঁথা, পর্দা, ছোট বাচ্চাদের নরম খেলনা, বালিশ ও লেপের কভার সপ্তাহে অন্তত একবার গরম পানি দিয়ে ধুতে হবে।

শোবার ঘরে পোষা প্রাণীকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

ঋতু পরিবর্তনের সময়ে, বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকতে হবে।

বাড়ির পরিবেশকে শুষ্ক রাখার পাশাপাশি আলো-বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ **'গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ'** থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত ইনফো কুইজ কার্ডটি আগামী ৩০ জুন ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

১. খাদ্যনালীর নিচের দিকে কোন ভালভ থাকে?

ক) পিউপিলারি স্ফিংক্টার
খ) পাইলোরিক স্ফিংক্টার
গ) নিম্ন খাদ্যনালী স্ফিংক্টার
ঘ) ইউরেথ্রাল স্ফিংক্টার

২. কোনটির কারণে বুক জ্বালাপোড়া হয় না?

ক) চা
খ) চর্বিযুক্ত বা মশলাদার খাবার
গ) কফি
ঘ) পানি

৩. কোন হার্নিয়ার কারণে পাকস্থলীর কিছু অংশ বুকে উঠে আসে?

ক) ইনগুইনাল হার্নিয়া
খ) হায়াটাস হার্নিয়া
গ) ফিমোরাল হার্নিয়া
ঘ) আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া

৪. অম্বল ব্যথার সাথে কোন ব্যথার মিল আছে?

ক) হৃদরোগের ব্যথা
খ) মাংসপেশির ব্যথা
গ) হাড়ের ব্যথা
ঘ) কিডনির পাথরের ব্যথা

৫. নিচের কোনটি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের লক্ষণ নয়?

ক) বমি বমি ভাব
খ) শ্বাসকষ্ট
গ) দাঁতের এনামেল ক্ষয় হয়ে যাওয়া
ঘ) চুলকানি

৬. শিশুদের মধ্যে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের লক্ষণ কোনটি?

ক) সর্দি
খ) বমি করা
গ) কাশি
ঘ) জ্বর

৭. কোনটি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের পরীক্ষা নয়?

ক) এন্ডোস্কোপি
খ) বেরিয়াম সোয়ালো এক্স-রে
গ) সিটি স্ক্যান
ঘ) ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি

৮. গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের ওষুধ কোনটি?

ক) পেনিসিলিন
খ) অ্যান্টাসিড
গ) বিটা ব্লকার
ঘ) ভিটামিন

৯. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার কতক্ষণ আগে রাতের খাবার খেতে হবে?

ক) ১-২ ঘণ্টা
খ) ২-৩ ঘণ্টা
গ) ৩-৪ ঘণ্টা
ঘ) ৫ ঘণ্টা

১০. গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের জটিলতা কোনটি?

ক) ব্যারেট'স ইসোফেগাস
খ) ইসোফেজাইটিস
গ) উপরের ক ও খ
ঘ) কোনোটিই নয়

এডভান্সড কেমিক্যাল
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এসিআই লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২
P241188

এপ্রিল ২০২৪
১৩তম পর্ব । ৩য় সংখ্যা

ইনফো মেডিকাস
স্বাস্থ্য সাময়িকী

ইনফো কুইজ কার্ড

এ এম এম টেরিটোরি কোড ----------

নাম _____

যোগ্যতা _____

ঠিকানা _____

_____

_____

মোবাইল নং _____

আপনার লিখিত এসিআই এর ওষুধ	
নং	নাম
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	

জিজ্ঞাসা

এসিআই এর পণ্য বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য নিচের অংশে লিখুন।

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন এবং কার্ডটি ৩০ জুন ২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

প্রশ্ন: ১	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ২	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৩	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৪	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৫	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৬	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৭	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৮	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ৯	ক	খ	গ	ঘ
প্রশ্ন: ১০	ক	খ	গ	ঘ